রাজার রাজা

রামমোহন

রাজার রাজা

রামমোহন

ডঃ অমিয় কুমার সেন

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়
জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য : টা. ৪·০০

মুদ্রাকর :
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬, শিবুবিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

রাজার রাজা রামমোহন

হুগলী জেলায় আরামবাগ বলে একটি মহকুমা আছে। আরামবাগ ছাড়িয়ে গ্রামের পথ ধরে আরও অনেকটা এগিয়ে গেলে খানাকুল বলে একটি গ্রামে এসে পৌঁছনো যাবে। গ্রামটি নির্জন। এখনও সেখানে যানবাহন বা আধুনিক যুগের শিল্প-কোলাহল, ব্যবসা-বাণিজ্যের হৈ-হুল্লোড় তেমন পৌঁছয়নি। ছায়াময় আমবাগানে ঘেরা এই প্রশস্ত রাধানগর গ্রামটিতে আজ থেকে দু'শো বছর আগে ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের প্রথম নায়ক রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর জন্মের সময় বাংলাদেশ তথা সমস্ত ভারত-বর্ষের অতি দুর্দিন। কিছুদিন আগে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজরা আস্তে আস্তে ভারতবর্ষের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করছিল। দিল্লিতে মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ বাদশা বাহাদুর শাহের সিংহাসন তখন টলমল। এখানে সেখানে নবাব-ওমরাহ রাজা-জমিদার গজিয়ে উঠে ভারতবর্ষ শত

খণ্ড হয়ে পড়েছে। দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা, সৎভাবে জীবন-ধারণের ইচ্ছা, ধর্মকর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান প্রায় লুপ্ত। নানারকম বিলাস-ব্যসন, বিবাদ-বিসংবাদ এবং অনাচার-কুসংস্কারে দেশ তখন নিমগ্ন। কিন্তু দেশজোড়া এই অন্ধকারের মধ্যে আবার একটু একটু আলোর রেখাও ফুটতে আরম্ভ করেছে। বিদেশীদের আগমনে অনেক নূতন ধ্যান-ধারণা, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তখন পুরনো সংস্কার এবং নূতন চিন্তার মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এক যুগ থেকে দেশ বা জাতি যখন নতুন যুগে উত্তীর্ণ হয় তখন এরকম সংঘর্ষ বা সংঘাতের মধ্য দিয়েই তাকে যেতে হয়। রামমোহনের জন্মকালে এই নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব আসন্ন হয়ে উঠেছিল। পুরাতন যুগ থেকে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীকে নূতন যুগে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব রামমোহনকে কখনও সহযোগীদের সঙ্গে কখনও বা নিঃসঙ্গ ভাবেই বহন করতে হয়েছে।

নূতনের মোহে আমরা একটা কথা প্রায়ই ভুলে যাই। সেটা হল পুরাতনের সব কিছুই বর্জন করা

সম্ভব নয়, অভিপ্রেতও নয়। পুরাতন সভ্যতা এবং সংস্কৃতি আদর্শচ্যুত হলেও তার মধ্যে চিরকালীন অনেক উপাদান প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। নূতনের মোহে সেগুলি বিসর্জন দিলে দেশ বা জাতির বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে নিজের সভ্যতার মধ্যে অন্যকে দান করার মতো উপাদানগুলিও লুপ্ত হয়। সেটা নিজের এবং অপরের পক্ষেও ক্ষতিকর। অন্যদিকে আবার নূতন সভ্যতার সবকিছুই গ্রহণ-যোগ্য নয়। পুরাতন সভ্যতার মধ্যে যেমন যুগ যুগ ধরে অনেক আবর্জনা জমা হয়, নূতন সভ্যতার প্রথম স্রোতেও তেমনি অনেক পাঁক ভেসে আসে। সেগুলিকে সত্য এবং চিরকালের বলে মনে করলেও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। যতদিন যেতে থাকে, নূতনের উদ্দীপনা যত কমে আসে, ততই এই পাঁক থিতিয়ে গিয়ে স্রোতের জল নির্মল হয়। যাঁরা দূরদর্শী তাঁরা বুঝতে পারেন, পুরাতন সভ্যতার নূতন উপাদান কোনগুলি, নূতন সভ্যতার আবর্জনা কি কি জিনিস। নিজের সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ভূমির উপর দাঁড়িয়ে নূতন সভ্যতার স্রোতের নির্মল অংশটিকে তাঁরা বেছে নিতে পারেন। নূতন এবং পুরাতনের এই দ্বন্দ্বকে, এই মিলনকে বলে যুগসন্ধি। আর যাঁরা

এই মিলনকে সফল করে তুলতে পারেন তাঁরা যুগস্রষ্টা। রামমোহন রায় আধুনিক ভারতবর্ষের যুগস্রষ্টা। পশ্চিমের দেশগুলি থেকে যে-সব নূতন চিন্তা এসেছিল সেগুলি আয়ত্ত করে তিনি সাহেব বনে যাননি। আবার দেশের প্রাচীন বহু চিন্তা দেশের লোকেরাই ভুলেছিল, সেগুলিকে পুনরায় চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন বলেই তিনি গোঁড়া পণ্ডিতও বনে যান নি। পূর্ব-দেশের চিন্তার সঙ্গে পশ্চিমের নূতন বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে যুক্ত করে তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের গোড়াপত্তন করেছিলেন। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে "ভারত-পথিক" বলে প্রণাম করেছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, রামমোহনই আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম বিশ্ব পথিক। ভারতবর্ষ তাঁর মাতৃভূমি কিন্তু অন্য কোনো দেশই তাঁর কাছে বিমাতৃ-ভূমি ছিল না। সারা পৃথিবী থেকে তিনি ভারতবর্ষের জন্য পুষ্টি আহরণ করেছিলেন। আর ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পদকে তিনি পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। ভারতবর্ষের নূতন যুগের সমস্ত মানুষের তিনি পূর্বপুরুষ।

মাত্র দুশো বছর আগে রামমোহন আমাদের মধ্যে

জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অথচ তাঁর ছেলেবেলার কাহিনী সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই জানা নেই। এমনকি কোন্ সনে তাঁর জন্ম হয়েছিল তা নিয়েও মতভেদ আছে। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তাঁর বন্ধু গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর সমাধির উপর একটি স্মৃতি-মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন। সে মন্দিরটি ভারতীয় রীতিতেই তৈরি। তার গায়ে লেখা আছে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন তাঁর প্রকৃত জন্মসন হচ্ছে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল একথাও কোনো কোনো মহলে প্রচলিত আছে। কিন্তু সে-মত বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। ১৭৭২ বা ১৭৭৪ যে খ্রীস্টাব্দেই তাঁর জন্ম হয়ে থাকুক, সে নিয়ে তর্কে তাঁর জীবন এবং কার্যাবলীর কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। রাধানগরে যেখানে রামমোহনের পৈতৃক ভিটে ছিল, সেখানেও দেশবাসী একটি স্মৃতি-মন্দির তৈরি করেছেন, তাঁর একপাশে তুলসী-মঞ্চের মতো একটি বেদী আছে। অনুমান করা হয় রামমোহনের আতুড়-ঘর এই বেদীর

জায়গা ঘিরেই ছিল। ছোটো আতুড়-ঘরে তুলসী-মঞ্চের মাটির প্রদীপের মতো যে-ছোটো আলোটি আজ থেকে দুশো বছর আগে জ্বলে উঠেছিল, তার দীপ্তিতে সারা ভারতবর্ষ—তো বটেই, একদিন ইয়োরোপের নানাদেশও আলোকিত হয়েছিল।

রামমোহনের পিতৃপুরুষদের আদি নিবাস ছিল মুরশিদাবাদ জেলায়। তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবাবের দরবারে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে "রায়" উপাধি পান। "রায়" মানে "রাজা"। রামমোহন আবার দিল্লির বাদশার কাছ থেকে "রাজা" উপাধি লাভ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর নামের সম্মুখে এবং পশ্চাতে "রাজা" উপাধি যুক্ত হয়ে আছে। পরবর্তীকালে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি প্রকৃতই "রাজার রাজা"।

রামমোহনের পিতার নাম রামকান্ত রায়। রামমোহনের মায়ের নাম তারিণী দেবী। কিন্তু সকলে তাঁকে "ফুল ঠাকুরাণী" বলে ডাকতেন। তিনি অত্যন্ত ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। তাঁর পূজা পার্বণ এবং দান-ধ্যানের খ্যাতি রায় পরিবারের নূতন নিবাস খানাকুল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রামমোহনের পূর্বপুরুষরা ছিলেন বৈষ্ণব। আর তারিণী দেবীর পিতৃকুল শাক্ত। কিন্তু তারিণী দেবী শ্বশুরবাড়িতে এসে বৈষ্ণব-ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

পরবর্তীকালে যাঁরা মহাপুরুষ বলে পরিচিত হন, তাঁদের শৈশবের কীর্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার কিম্বদন্তী গড়ে ওঠে। রামমোহনের পূর্বজীবন অনেকাংশে অজ্ঞাত তাই তাঁকে ঘিরেও অনেক কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হয়েছিল। কথিত আছে, একবার মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে গিয়ে রামমোহন পিতামহের শিব পূজার জন্যে আনা বেলপাতা চিবিয়ে ফেলে-ছিলেন। পিতামহ তাঁকে এই বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে এই ছেলে বিধর্মী হবে। তারিণী দেবী বাবার পায়ে ধরে কেঁদেছিলেন বলে পরে তিনি বলেছিলেন, এই অভিশাপ ফলবেই। তবে অভিশপ্ত এই ছেলে রাজার মতো সম্মান পাবে এবং অসাধারণ মানুষ বলে গণ্য হবে। এই গল্পটি যে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিশুবয়সে রামমোহন গ্রামের পাঠশালায় কিছু কাল নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। সে-কালের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তিনি অল্প বয়সে ফারসী ভাষাও

শিখতে আরম্ভ করেন। রামমোহনের জন্মের কিছু-কাল আগে যদিও দেশে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবু ফারসী বহুদিন রাজকার্য পরিচালনার ভাষা ছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজকার্যে ইংরেজি প্রচলনের স্বপক্ষে রামমোহন বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে। শিশু বয়স থেকেই নানা বিষয়ে বিশেষ করে বিভিন্ন ভাষা আয়ত্তের ক্ষেত্রে তার বিশেষ মেধা ছিল। তাঁর বয়স যখন নয় বৎসর তখন তাঁর পিতা আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য তাঁকে পাটনাতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিনি এ-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আরবী ভাষায় তিনি বিখ্যাত গাণিতিক ইউক্লিড এবং বিখ্যাত দার্শনিক এ্যারিস্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। মূল গ্রন্থগুলি গ্রীক ভাষায় লেখা। পরবর্তীকালে হাফিজ প্রভৃতি পারসিক কবি এবং সুফী সম্প্রদায়ের কাব্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। অনেকের ধারণা একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে তাঁর মতামত সুফীদের কাছ থেকেই তিনি প্রথম সংগ্রহ করেছিলেন।

পাটনাতে আরবী এবং ফারসী শিক্ষা করার পর পিতার আদেশে তিনি সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্র পাঠ

করবার জন্য কাশীতে যান। তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো বৎসর। রামমোহন এত মেধাবী ছিলেন যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সংস্কৃতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করলেন। প্রাচীন শাস্ত্র পড়তে গিয়ে তিনি অল্প বয়সেই হিন্দু দর্শনের "একমেবেমাদ্বিতীয়" ব্রহ্মোপাসনার প্রতি আকৃষ্ট হন। গৃহে ফিরে এসে এ বিষয়ে তাঁর পিতার সঙ্গে মতভেদ হতে লাগল। ষোল বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু শাস্ত্রের পৌত্তলিকতাকে নিন্দা করে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম প্রনালী" নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন বলে কথিত আছে। এটি অবশ্য মুদ্রিত হয় নি কিন্তু এটি লেখার ফলে তাঁর পিতার সঙ্গে তাঁর মতভেদ একটি চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করল। রামমোহন নিজের ইচ্ছায় গৃহত্যাগ করলেন। তিনি এ-সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন। নানা প্রদেশে পরিভ্রমণের সময় তিনি আঞ্চলিক ভাষা এবং বিভিন্ন সাহিত্য এবং ধর্মবিশ্বাসের সহিত পরিচিত হন। পরিণত বয়সেও তিনি কবীর, দাদূ, নানক, মধ্যযুগের সাধকদের রচনা থেকে অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন।

কথিত আছে এ সময় তিনি হিমালয় অতিক্রম

করে তিব্বতে গিয়ে উপস্থিত হন। অনেকে মনে করেন বিদেশী শাসকদের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল বলে তিনি এই অভিযান করেছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্যই এই বিপদ্‌জনক অভিযানে ব্রতী হয়েছিলেন। তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের যে রূপ দেখেছিলেন তার ফলে তরুণ রামমোহনের মনে অভিযোগ জমে উঠেছিল। এই অভিযোগ প্রকাশ করার ফলে ধর্মযাজকগণ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রাণ সংশয় হয়ে ওঠে। কিন্তু তিব্বতী মহিলারা এই সুদর্শন তরুণকে রক্ষা করেছিলেন। সেজন্য তিনি সারাজীবন নারী জাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ আছে।

প্রায় চার বৎসর পরে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তাঁর পিতা, পুত্রের সঙ্গে এই দীর্ঘ বিচ্ছেদে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পশ্চিম ভারত থেকে পুত্রকে নিয়ে আসার জন্য একজন লোকও পাঠিয়েছিলেন। রামমোহন যখন গৃহে ফিরে এলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। পিতা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

রামমোহনের এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখা হয়নি। যদি হত তাহলে সেটি বাংলা এবং ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ হত। তখনকার দিনে যান-বাহন এত উন্নত হয় নি। দেশের অনেক অংশে অরাজকতা চলছিল—পথে বিপদের অবধি ছিল না। শুধু পায়ে হেঁটে একাকী তখনকার দিনে একটি তরুণ ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল এবং ভারতবর্ষের বাইরের কোনো কোনো অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন একথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। পূর্ববর্তী ধর্মসাধকরা বহুবার এ কাজ করেছেন। ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তীর্থভ্রমণে যাওয়া ধর্মসাধনার একটি অঙ্গ ছিল। এর ফলে দেশের সঙ্গে সোজাসুজি পরিচয় ঘটত। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্র্য, দেশের মানুষের নানারকম আচার-ব্যবহার রীতি নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হত। আমাদের দেশে বৌদ্ধ-শ্রমণরা, জৈন তীর্থংকররা, বৈষ্ণব-শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তরা সকলেই এ ধরনের পদযাত্রা করতেন। রামমোহনের পক্ষে এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তার পরবর্তী জীবনে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল।

রামমোহনের তিন বিবাহ ছিল। তাঁর বিরোধী

সমালোচকরা এই ঘটনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে রামমোহনের প্রথম পত্নীর যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র আট বৎসর। তারপর এক বছরের মধ্যেই পরপর তার পিতা তাঁকে আরও দুটি বিবাহ দিয়েছিলেন। তখনকার সামাজিক রীতি বহু বিবাহের অনুকূল ছিল। তাছাড়া বিবাহের সময় রামমোহন বালক ছিলেন। যদিও নীতিগত-ভাবে বহুবিবাহ সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবুও ব্যক্তিগত জীবনে পিতার আজ্ঞায় এই কলঙ্ক তাঁকে বহন করতে হয়েছে।

চার বৎসর ভারতবর্ষ ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ভ্রমণ করে গৃহে ফিরে আসার পর, তাঁর পিতা ভেবেছিলেন এবার রামমোহন সংসারধর্মে মন দেবেন। রামমোহন গৃহে এসে সংস্কৃতশাস্ত্র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু এর ফলে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে তাঁর মতামত আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। এ নিয়ে পিতার সঙ্গে তাঁর মতান্তর অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া নানা প্রকার কুসংস্কার ও অর্থহীন প্রথা দিয়ে দুজনের প্রায়ই মতভেদ হতে থাকে। তিনি পিতার প্রায় ত্যজ্যপুত্র রূপেই পরিগণিত হন।

প্রচলিত যে-সব সংস্কার সম্বন্ধে রামমোহন অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল নির্বোধ পৌত্তলিকতা। ব্রহ্ম বা ভগবান সাকার না নিরাকার এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন একসময় বলেছিলেন ব্রহ্ম দুই রূপেই থাকতে পারেন, তবে যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁদের সাকার উপাসনার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় হল সহমরণ প্রথা। তিনি অল্পবয়সে তাঁর এক ভ্রাতৃবধূকে সহমরণে যেতে দেখেছিলেন। সেদিন তাঁর মনে যে বেদনা জেগেছিল, সেটাই তাঁকে এই সামাজিক দুষ্ট ব্যাধি দূর করার জন্য নিয়োজিত করেছিল! তবে আইন করে সহমরণ বন্ধ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন নি। কিছুদূর পর্যন্ত তিনি আইনের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। বাকিটা অংশ হৃদয়ের পরিবর্তনের দ্বারা সাধিত হবে এই ছিল তাঁর মত। আইনের বলে জোর করে সহমরণে যেতে বাধ্য করা বন্ধ করা হয়েছিল; কিন্তু স্বেচ্ছায় সহমরণগামিনীকে বাধা দেবার ব্যবস্থা হয় নি। সেজন্য পরিণত বয়সে রামমোহন গঙ্গার শ্মশান ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছেন, যদি একটি মাত্র সদ্য বিধবাকে এই সংস্কারের অন্ধ নাগপাশ থেকে রক্ষা করতে পারেন। লোকে তাঁকে

পাগল বলে উপহাস করেছে। কিন্তু নিরস্ত করতে পারে নি। তিনি যখন রংপুরে সরকারী কাজে নিযুক্ত তখন তাঁর আর এক বড়ো ভাইয়ের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ছুটতে গ্রামে এসেছিলেন, যদি কোনো রকমে বিধবাকে বাঁচানো যায়। কিন্তু গ্রামের বাইরে থেকেই জানতে পারলেন যে তিনি পৌঁছবার আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি গ্রামে আর না ঢুকে ফিরে যান।

তাঁর নিজের একাধিক বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু বহুবিবাহ সম্বন্ধে তার মতামত পরবর্তীকালের একটি ঘটনায় বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তাছাড়া বহুবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর নানাসময়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঘটনাটি এই। তাঁর একজন শিষ্য নন্দকিশোর বসুর বিবাহের আগে তাঁকে একটি সুন্দরী কন্যা দেখিয়ে সম্মতি যোগাড় করে পরে অন্য একটি কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেন। সে-কন্যা সুন্দরী ছিলেন না। নন্দকিশোর তাঁর শ্বশুরের এই প্রতারণায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিহিংসা নেবার জন্য অন্য আর একটি কন্যাকে বিয়ে করা মনস্থ করেন। শোনা যায়, রামমোহনই তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যে গাছ ভালো ফল দেয় সে গাছই সুন্দর, যে স্ত্রী সৎপুত্র

উপহার দেন তিনিই সুন্দরী। দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তুমি তোমার প্রথমা স্ত্রীকে অবহেলা করো না।" এ-যুক্তি নন্দকিশোরের মন যে ভাবে স্পর্শ করেছিল অন্য প্রকার শত উপদেশেও তা হত না। পরে রামমোহনের উপদেশ সফল হয়েছিল। নন্দকিশোরের পুত্র রাজনারায়ণ বসু সে-কালের বাংলা দেশের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সমাজ-সংস্কারক বলে পরিগণিত হয়েছিলেন।

বিয়েতে পণ প্রথার লোপের জন্য রামমোহন সর্বপ্রথম আন্দোলন করেছিলেন। হিন্দু নারীর স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়েও আইন প্রণয়নের জন্য যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন রামমোহন তাঁদের অগ্রগণ্য।

এগুলি বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের কথা। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে যে-কোনো মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর মানসিক যোগাযোগ ছিল। কোনো কোনো আন্দোলনকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, কোনোটাতে তিনি উপদেষ্টার পদও গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার সময়ের পৃথিবীতে, পূর্ব-পশ্চিম কোনো দেশে তাঁর মতো দূরদ্রষ্টা মানুষ আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। স্পেনের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধকে তিনি একটি বড়ো ঘটনা মনে

করতেন। ইংরেজদের নিজের দেশে "রিফরমস বিল" নামে একটি যুগান্তকারী আইনকে কি ভাবে পরিচালিত করতে হবে, সে সম্বন্ধে ইংরেজের অধীন দেশের প্রতিনিধি হয়েও উপদেশ দিয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ফলে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কাজেই সে বিপ্লবকে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের একটি মহত্তম ঘটনা বলে মনে করতেন। কিন্তু বিদেশীদের পক্ষে ফ্রান্স যাবার জন্য বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন আছে বলে তিনি খোদ ফরাসী সম্রাটকে এ-অন্যায় অনুমতির প্রথা খারিজ করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর সে চিঠি পৃথিবীর ইতিহাসে আধুনিক চিন্তার একটি মূল্যবান দলিল বলে বিবেচিত হবে।

এসব প্রসঙ্গ পরে যথাস্থানে আলোচিত হবে। এঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যায় যে তিনি ভারতপন্থা অবলম্বন করে বিশ্বপথের চৌমাথায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আধুনিক পৃথিবীতে রামমোহনই প্রথম বিশ্বপথিক। এটা ভারতবর্ষের পক্ষে কম গৌরবের নয়।

পিতার সঙ্গে মতান্তর রামমোহনকে বেদনা দিয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজে যা সত্য বলে

মনে করেছিলেন তার সঙ্গে কোনো আপস করতে তিনি রাজি ছিলেন না। এমন কি তাঁর পিতার মৃত্যুর পর মাতা ফুল ঠাকুরাণী তাঁকে বিধর্মী বলে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য মামলা করেছিলেন। সে মামলায় রামমোহন নিজে বিধর্মী নয় প্রমাণ করার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন কিন্তু পিতার সম্পত্তি গ্রহণ করেন নি। তিনি বলে-ছিলেন, "আমার সমস্ত তর্কে-বিতর্কে আমি কখনও হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই, আমার, আক্রমণের বিষয় ছিল।" আইন অনুসারে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হলেও রামমোহন মাতা ফুল ঠাকুরাণীর সম্পত্তি পরিচালনার সমস্ত দায়িত্বকে স্বীকার করে নিয়ে-ছিলেন, তবে তিনি কিছুকাল পিতৃগৃহে বাস করেন।

তখনও বাংলাদেশ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনভার ইংলণ্ডের রাজার অধীনে ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডের রাজার নামে দেশ শাসন করতেন। সরকারী কাজ লাভ করতে হলে ইংরেজি ভাষা জ্ঞানের দরকার ছিল। তাই রাম-মোহন বেশি বয়সে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে-

ছিলেন। দেওয়ানি বা সেরেস্তদারি পাবার আশায় তাঁকে প্রথমে কেরানীগিরি করতে হয়েছিল। জন ডিগবি বলে একজন ইংরেজের অধীনে তিনি কেরানীর পদে নিযুক্ত হলেন। তাঁর কর্ম ক্ষমতায় অল্প কদিনের মধ্যে দেওয়ানের পদে উন্নীত হন বলে প্রকাশ। এ সময় তাঁকে রংপুর ভাগলপুর প্রভৃতি জায়গায় কাজ করতে হয়েছিল।

যদিও ইংরেজের অধীনে তিনি সামান্য কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন তবু আত্মসম্মান তিনি কখনও বিসর্জন দেন নি। কাজে ঢোকার আগে তিনি শর্ত করে নিয়েছিলেন যে তিনি কাজের জন্য ডিগবি সাহেবের কাছে গেলে তাঁকে বসার জন্য উপযুক্ত আসন দিতে হবে। আর সাধারণ আমলাদের সম্পর্কে যে-প্রকারে অপমানকর হুকুম জারি করা হয় তাঁর সম্পর্কে সে রকম করা চলবে না। ডিগবি সাহেব রামমোহনের অনুরোধে এই শর্তগুলি মেনে নিয়ে একটি দলিল লিখে দিয়েছিলেন।

ভাগলপুরে আর একটি ঘটনায় তাঁর আত্মসম্মান-বোধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগলপুরে পৌঁছবার দিনই সেখানকার কালেকটরের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া বেধে যায়। ইংরেজরা নিজেদের দেশে

অবশ্য মিথ্যা মর্যাদাবোধের দ্বারা চালিত হতেন না। কিন্তু বোধকরি মোগল দরবারের কিছু নিয়মকানুন তাঁরা উত্তরাধিকারী সূত্রে তখনও পালন করে চলছিলেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সামনে দিয়ে নিম্নপদের কর্মী বা সাধারণ লোকের পালকি করে যাওয়া তখনকার সময় পর্যন্ত বেয়াদপি বলে গণ্য হত। ভাগলপুরের কালেকটর সাহেব একটা ইঁটের পাঁজার উপর দাঁড়িয়েছিলেন। আর রাম-মোহন তার সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে পালকি করে যাচ্ছিলেন। সেটা কালেকটর সাহেবের মর্যাদায় বাধল। তিনি ডাকাডাকি করে পালকি থামাতে বলে শেষ পর্যন্ত নিজেই ঘোড়ায় চড়ে রামমোহনের মুখোমুখি হলেন। রামমোহন বিনীত ভাবে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে কোনো মানুষের সামনে অন্য মানুষ, পালকি করে গেলে অপমান বোধ করার কোন কারণ নেই। এই মিথ্যা মর্যাদাবোধ বড়ো এবং ছোটো দুজনকেই হেয় করে। কিন্তু সাহেব সে-কথায় কর্ণপাত করতে চান না। অবশেষে রামমোহন অধৈর্য হয়ে পালকি চড়েই চলে গেলেন। সাহেবের সঙ্গে অনর্থক তর্কাতর্কি করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। কিন্তু তিনি বড়লাটের কাছে

বিষয়টি জানিয়ে একটি অতি সুন্দর চিঠি লেখেন। সে চিঠিতে বিনয়ের সঙ্গে আত্মসম্মানবোধ এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মধ্যে সমতা-বোধের কথা লেখা হয়েছিল। বড়লাট সে চিঠি পেয়ে কালেকটার সাহেবকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। রামমোহনের নির্ভীকতা এবং অন্যায়ের প্রতিকার করার ক্ষেত্রে অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে।

জন ডিগবি রামমোহনের কর্মক্ষমতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। রামমোহনও তাঁর কাছে ইংরেজি ভাষাটা ভালোভাবে শিখে নিয়েছিলেন। বেদান্ত সুত্রের ভাষ্য এবং কোনোপনিষদের চূর্ণক রামমোহন ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। তার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন জন ডিগবি স্বয়ং। সে ভূমিকা থেকে আমরা জানতে পারি রামমোহন বাইশ বৎসর বয়সে প্রথম ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেন কিন্তু ডিগবির অধীনে কর্ম গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত তাঁর সে-শিক্ষা বিশেষ এগোয় নি। কিন্তু কর্ম উপলক্ষ্যে তিনি এ ভাষা সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করেন। শুধু তাই নয় এই ইংরেজি ভাষার মধ্যস্থতায় একটি নতুন জগতের দরজা রামমোহনের চোখের সামনে

খুলে গেল। ইয়োরোপ বিশেষ করে ফরাসী দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল একথাও জন ডিগবির ভূমিকা থেকেই জানা যায়। এই আগ্রহ তিনি আজীবন রক্ষা করেছিলেন। ইয়োরোপ খণ্ড থেকে প্রবাহিত বিজ্ঞান এবং শিল্প সম্বন্ধে সচেতনতা ভারতখণ্ডেও আহ্বান করে নিয়ে আসতে হবে এ সংকল্প তাঁর মনকে অধিকার করেছিল। এর ফলে শুধু যে আমাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে তাই নয়, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হলে আমাদের যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের ভস্মস্তূপ আপনিই ভেসে যাবে। সেজন্যই তিনি পৌরাণিক যুগের ভগীরথের মতো বৈজ্ঞানিক চিন্তার গঙ্গা-ধারাকে কম্বুকণ্ঠে ভারতবর্ষের মাটিতে অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন। আধুনিক ভারতবর্ষের তিনি ভগীরথ।

রামমোহন ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর কাজ ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করতে এলেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কিছু বেশি। এবার তিনি তাঁর নিজের পরিকল্পনা অনুসারে দেশ এবং জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তাঁর প্রথম এবং প্রধান কাজ হল হিন্দু-ধর্মের সংস্কার

সাধন। হিন্দু-ধর্মের মূল অনুশাসনগুলি কালক্রমে লুপ্ত বা বিকৃত হয়ে পড়েছিল। ধর্মের নামে কতকগুলি ভ্রষ্ট আজব এবং গোঁড়ামি তার স্থান দখল করেছিল। তখন খ্রীষ্টান পাদরিরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করছিলেন। বহুলোক হিন্দুধর্মের গোঁড়ামিতে অতিষ্ঠ এবং অত্যাচারিত হয়ে খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু ধর্মে বহু দেবতার পূজা হয় বলে পাদরিরা তার নিন্দা করতেন। আর রামমোহন প্রচলিত হিন্দু আচারকে নিন্দা করতেন। পাদরিরা বোধ হয় তাতেই উৎসাহিত হয়ে হিন্দু-ধর্মের নানা অপব্যাখ্যা করতে লাগলেন। রামমোহন এই নিয়ে খ্রীষ্ট্রীয় ধর্মযাজকদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়ে গেলেন। অন্য ধর্মকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করতেন। তাঁর মতে সব ধর্মের সারবস্তু গ্রহণ করতে পারলে বিবাদের প্রয়োজন থাকে না। রামমোহন সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরানও যত্ন সহকারে মূল আরবীতে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্র এবং মুসলমান ধর্মশাস্ত্র মন্থন করে একথা প্রমাণ করলেন যে এক ঈশ্বরের উপাসনা আমাদের দেশেও নূতন নয়। এদেশে

প্রচলিত প্রধান দুটি ধর্মেই এক ঈশ্বরের উপাসনার বিধান আছে। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হবার জন্য তাঁকে মূল বাইবেলও পড়তে হয়েছিল।

তর্কযুদ্ধ বিরোধী পক্ষের অসহিষ্ণুতা অনেক সময় ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এবং কটূক্তিতে পরিণত হয়। এ-বিষয়ে রামমোহনের সহিষ্ণুতা আদর্শস্বরূপ। একবার একজন পাদরি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার অশালীন মন্তব্য করেছিলেন। তিনি উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, "সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের জানা কর্তব্য যে, আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম-সংক্রান্ত বিচারে উদ্ভত হইয়াছি; পরস্পরে দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই"; অন্য আর একবার তর্কের সময় একজন ধর্মযাজক ইঙ্গিত করেছিলেন যে যেহেতু রামমোহন মূল বাইবেল পড়েননি সেহেতু খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যায় তার অনেক গলদ রয়ে গিয়েছে। অন্য কোন প্রতিপক্ষ হলে এবিষয়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন। রামমোহন চিন্তা করলেন, যে একথা হয়তো সত্য হতে পারে। মূল বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদে হয়তো এ ব্যাখ্যাটি আরোপিত

হয়েছে। তাই তিনি প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিলেন যে তিন মাস পরে তিনি এই বিষয়ের জবাব দেবেন। কঠিন সাধনায় তিন মাসের মধ্যে হিব্রু ভাষা আয়ত্ত করে মূল বাইবেল পাঠ করে তিনি সেই যাজকের তর্কের উত্তর দিয়েছিলেন। এটা শুধু তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠার পরিচায়কের, উদার মনেরও বিশিষ্ট উদাহরণ।

শুধু যে খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে তাঁকে তর্কে লিপ্ত হতে হয়েছিল তাই নয়, হিন্দুধর্মের গোঁড়া সম্প্রদায় তাঁকে কঠিন আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রের জ্ঞানও যে-কোনো পাণ্ডিত্য অভিমানী শাস্ত্রজ্ঞ'র থেকে বেশি ছিল, তাই সে তর্কবিতর্কে তিনি সগৌরবে জয়লাভ করেছিলেন।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে হিন্দুশাস্ত্র প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা প্রকাশে রামমোহন উদ্যোগী হয়েছিলেন। "বেদান্ত", "বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য" "বেদান্ত সার" "উপনিষদ" ইত্যাদি নানাগ্রন্থ এসময় রচিত হয়। এগুলির মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থের ইংরেজি এবং হিন্দুস্থানী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। হঠাৎ যেন মৌচাকে ঢিল

ছোঁড়া হল। গ্রন্থগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো পণ্ডিত তাঁর ভাষ্য সম্বন্ধে আপত্তি করেছিলেন কিন্তু অধিকাংশ গোঁড়া পণ্ডিতই অন্যদিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করেন। একদল বলতে থাকেন এই সব শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারও অধিকার নেই। রামমোহন অনুবাদ করে এগুলি সর্বসাধারণের অধিকার বিস্তার করে দিয়েছেন। সেটা হিন্দুধর্ম-বিরোধী আচরণ। রামমোহন খুব ধৈর্য সহকারে এসব কথার উত্তর দিয়েছিলেন। কোনো পণ্ডিত তাঁর ভাষ্যের মধ্যে নানা অপব্যাখ্যা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গেও রামমোহন ভদ্রভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিহেন। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি। প্রথম বিচার চলে মাদ্রাজ হিন্দু কলেজের অধ্যাপক শংকর শাস্ত্রীর সঙ্গে। শংকর শাস্ত্রীর ইংরেজি প্রতিবাদের রামমোহন ইংরেজিতেই দিয়েছিলেন। একটি কৌতূহলের বিষয় হল এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে ভগবৎ উপাসনার মধ্যে সংগীত এবং নৃত্যের স্থান নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। রামমোহন নৃত্যের সমর্থক ছিলেন না কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনার মধ্যে সংগীত একটি অপরিহার্য উপাদান। রামমোহন

নিজেও সুরতালের নির্দেশ দিয়ে অনেক ব্রহ্ম সংগীত রচনা করেছিলেন।

কলকাতার গভর্ণমেণ্ট কলেজের একজন অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের সঙ্গে তার বিতর্ক হয়েছিল। বিদ্যালংকারের গ্রন্থ "বেদান্ত পত্রিকা"তে তিনি রামমোহনের প্রতি অনেক দুর্বাক্য ব্যবহার করেছিলেন। উত্তর দেবার সময় রামমোহন বলেছিলেন, "আমাদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, দুর্বাক্য ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার কারণ আদৌ এই যে, পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধুভাষা এবং দুর্বাক্য সর্বথা অযুক্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ, আমাদিগের এমত রীতিও নহে যে, দুর্বাক্য কথন বলনের দ্বারা জয়ী হই। অতএব, ভট্টাচার্যের দুর্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।" একশত বৎসর ঊর্ধ্বকাল আগে এরূপ যুক্তিসহ বিচার পদ্ধতি যেমন বিরল ছিল, আজকের দিনেও হয় তো তেমন আছে। এক্ষেত্রে রামমোহনের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন লোক বেশি নেই।

রামমোহন প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রথায় ভগবদ্ পূজার একেশ্বরবাদসম্মত একটি রীতি প্রচলিত করার উদ্দেশ্যে এবং সকল ধর্মে মূল সত্য আলোচনা করার

জন্য "আত্মীয় সভ্য" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন। সেটা ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে। গোঁড়া হিন্দু সমাজ এবং খ্রীষ্ট্রীয় মিশনারী, কেহই এ সভা পছন্দ করেন নি। এমন কি এর জন্য তাঁকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য অন্যান্য শরিকরা আদালতের মামলা পর্যন্ত দায়ের করেছিল। কলকাতার হিন্দু সমাজের একজন ধনবান প্রতিভূ রাধাকান্ত দেব ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের মতামতকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য একটি বিচার সভা আহ্বান করলেন। সেখানে দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রমুখ বহু পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সুব্রহ্মণ শাস্ত্রীর সঙ্গে রামমোহন তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করেন।

খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে যেমন রামমোহন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্রতী হয়েছিলেন, হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কে তেমনি হিন্দুধর্ম লোকাচার এবং কুসংস্কারগুলিকে অপসৃত করে সনাতন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, তর্কে ক্ষমার জয় হল বা পরাজয় হল সেটা বড়ো কথা নয়; সত্য উদ্‌ঘাটিত হল কিনা সেটাই বড়ো কথা। রাম-

মোহনের সারাজীবন ও কর্মসাধনায় তিনি এই কথা প্রমাণ করেছিলেন।

"আত্মীয় সভা" প্রতিষ্ঠার কথা আগেই বলা হয়েছে। সে-সভাই পরে "ব্রাহ্মসমাজ" নামে পরিচিত হয় এবং রামমোহন প্রবর্তিত একেশ্বরবাদ ব্রাহ্মধর্ম নামে পরিচিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ এবং ধর্মের প্রকাশ অবশ্য হয়েছিল রামমোহনের বন্ধুপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায়। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের পিতা।

ব্রহ্ম-উপাসনার পদ্ধতির প্রবর্তন ছাড়াও রামমোহন সামাজিক আরও নানা সংস্কারের প্রবর্তন করে-ছিলেন, বা প্রবর্তনে সহায়তা করেছিলেন। তাঁর বেশির ভাগই সমাজে নারীদের নির্যাতন এবং নারীর অধিকার রক্ষা সম্বন্ধীয়। তার মধ্যে সহমরণ প্রথা লোপ একটি সামাজিক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন তারই পরিণতি।

নারীদের প্রতি রামমোহনের একটি সহজাত সহানুভূতি ছিল। তাছাড়া হিন্দুসমাজে নারীদের প্রতি অবিচার একটি কুসংস্কারে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন যুগে সমাজে নারীদের যে উচ্চস্থান ছিল নারী-

জাতি সে স্থান থেকে চ্যুত হয়েছিলেন। বহু অন্যায় অবিচার দিয়ে তাঁদের আবদ্ধ করা হয়েছিল, সহমরণ প্রথা তার অন্যতম। শিশুকালে একবার এবং রংপুরে কার্যকালে একবার রামমোহন নিজের পরিবারের মধ্যেই সহমরণের দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর শিশু মনে এই নিষ্ঠুর প্রথা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, পরিণত বয়সে নানা শাস্ত্র মন্থন করে তিনি এই অনুশাসনের পক্ষে যুক্তি খুঁজে পান নি। আর মানবিকতার দিক থেকে এ প্রথা সমর্থনযোগ্য তো ছিলই না। আগে থেকেই ইংরেজ সরকার এ প্রথা রামমোহনের সহযোগী এবং অনুরাগীদের সমর্থনে বিদেশী সরকার আইন করে এই প্রথা বিলোপের চেষ্টা করেন। তখনকার গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিকের নাম এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আইনে অবশ্য সহমরণ প্রথাকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়নি কিন্তু জোর করে স্ত্রীকে সহমরণে বাধ্য করা রদ হয়ে যায়। রামমোহন উন্মত্তের মতো শহরের শ্মশানঘাটগুলিতে ঘুরে বেড়িয়ে যদি একটি মাত্র সভবিধবাকে এই লোকাচারের অনুশাসন থেকে রক্ষা করতে পারেন সে-চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। লোকে তাঁকে উপহাস করেছে, তবু তিনি নিবৃত্ত হন

নি। রামমোহনের অবশ্য মত ছিল স্ত্রী স্বামীর অনুমৃতা না হয়ে যদি ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাহলেই হিন্দু-শাস্ত্রের প্রাচীন অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হবে। আইনের বলে সহমরণ প্রথা বহু পরিমাণে সমাজ থেকে অপসারিত হয়েছিল বলে রামমোহনের প্রয়াসে ১৮৩০ সনে লর্ড বেণ্টিককে একটি সংবর্ধনা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই অভিনন্দন পত্রটি ইংরেজিতে রামমোহনই রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। উপসংহারে যে বাক্যটি আছে সেটি অনবদ্য।—"যাঁরা আপনার এই অনুগ্রহ লাভে আমাদের সঙ্গে সম-পরিমাণ অংশভাগী অথচ অজ্ঞতা বা কুসংস্কারের বসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন নি, তাঁদের আপনি ক্ষমা করবেন", ইংরেজি রচনায় রামমোহনের কৃতিত্ব আরও বহু উদাহরণ আছে। এই রচনাটিতে তদুপরি যে-মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, সেটি রাম-মোহনের দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় বহন করেছে।

নারীজাতির আর একটি বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে রামমোহন তাঁর লেখনী উদ্যত করেছিলেন। সেটি হিন্দু নারীর দায়াধিকার। তৎকালীন আইনের অধিকার যে অশাস্ত্রীয় সেটি বহু যুক্তি প্রমাণ সহযোগে

তিনি প্রমাণ করেছিলেন। মৃত পতির সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার খর্ব করার বিষয়ে রামমোহনের মতামত অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। এই খর্বতা বহু নারীকে সহমরণে প্ররোচিত করে বলে তাঁর ধারণা ছিল। রামমোহনের বহু পরবর্তীকালে এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কন্যাপণ সম্বন্ধেও তাঁর মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। আজ সমাজদেহ থেকে এই ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। এই প্রথার বিরুদ্ধে শতাধিক বৎসর পূর্বে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণও উদ্ধৃত করেছিলেন।

বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ সম্বন্ধে রামমোহনের যে মতামত সেকালে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি পাঠ করেও আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। শুধু জন্ম নয় কর্ম দিয়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে হয়, শরীরের বর্ণ বা যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ব্রাহ্মণের পরিচয় নয় একথা রামমোহন নূতন যুগের সূচনায় প্রথম প্রচার করে-ছিলেন একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য।

রামমোহনের লেখায় বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রয়োজনীয়তার আভাস ছিল। সে-আভাসকে তিনি যুক্তির পূর্ণতা দান করেননি। সে সম্ভাবনার পরিণতির জন্য বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

রামমোহন নিজে বিদ্যোৎসাহী এবং পণ্ডিত ছিলেন। ফারসী, আরবী, সংস্কৃত, ইংরেজি হিব্রু ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় তাঁর পরিপূর্ণ দখল ছিল। তাছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক ভাষার সঙ্গে তাঁর মোটামুটি ভালো পরিচয় ছিল। বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে তিনি চিরকাল পূজিত হবেন। শুধু আখ্যান বা কাহিনীর উপযুক্ত যে বাংলা গদ্য সেটা রামমোহনের পূর্বেই রচিত হয়েছিল ; কিন্তু যুক্তিতর্ক এবং নানা জ্ঞান আলোচনার ভাষারূপে বাংলা গদ্যের ব্যবহার রামমোহনের প্রয়াসেই প্রতিষ্ঠিত হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "তখন গদ্য বাক্যবিন্যাস কী করিয়া বুঝিতে হয়, রামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্দেশ করিয়া, তবে গদ্য লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।" অন্য জায়গায় আবার লিখেছিলেন, "রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন।" বাংলাভাষার শিল্পীরূপে হয়তো তাঁকে পরিচিত করা যাবে না। কিন্তু বাংলা গদ্যের স্বরূপ সন্ধানের

গৌরব অনেকাংশে তাঁর প্রাপ্য। রামমোহন তাঁর দূরদর্শিতার দ্বারা একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষে কিছুকালের যেমন ইংরেজ শাসন কায়েম হয়েছে, তেমনি ইংরেজি ভাষা এবং তার মধ্য দিয়ে পশ্চিমী রীতির শিক্ষাও ভারতে প্রচলন করা দরকার। সংস্কৃত ভাষা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধারণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ, আরবী ফারসী প্রভৃতি ভাষাও তাই। আধুনিক ভারতীয়ভাষাগুলি তখনও একাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তাই ইংরেজের রাজনৈতিক শাসনের মতো ইংরেজি ভাষা,এবং ইংরেজি শিক্ষারীতির শাসনও ভারতবর্ষের পক্ষে সে সময় প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইংরেজরা এদেশে প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষকে আধ‍ুনিক স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত হয়ে উঠতেই হবে। তেমনি ইংরেজি ভাষাকে অবলম্বন করে আধ‍ুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে স্বদেশী ভাষায় সেগুলিকে জনসাধারণের মনে প্রবাহিত করে দিতে হবে। এটা শুধ‍ু তাঁর অলস চিন্তা ছিল না, সমগ্র ভারবর্ষের মধ্যে স্বদেশী ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার তিনি অন্যতম অগ্রদূত।

তিনি বাংলাভাষার একটি ভূগোল গ্রন্থ রচনা

করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল "জ্যা-গ্রাহী"। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত তার পুস্তকের নাম "খগোল"। ক্ষেত্রতত্ব সম্বন্ধে তাঁর পুস্তকের নাম দিয়েছিলেন "জ্যামিতি", "জাগ্রহী" বা "খগোল" নামগুলি বাংলায় প্রচলিত হয়নি। কিন্তু "জ্যামিতি" আজও প্রচলিত। ইংরেজদের বাংলা শিক্ষার জন্য তিনি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় একটি বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে বাঙালীদের জন্য বাংলায় "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" রচনা করেন। তাঁর আগে হয়তো কেউ কেউ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন কিন্তু রামমোহনের "গৌড়ীয় ব্যাকরণই" সমধিক পরিচিত। বাংলাতে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য "টেকস্টবুক সোসাইটি" নামে একটি সংস্থা ছিল। রামমোহন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রধানত রামমোহনের অনুকরণে ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায়ও সে-অঞ্চলের ভাষার ব্যাকরণ এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণের পাঠ্য পুস্তক রচনা আরম্ভ হয়। প্রাদেশিক ভাষায় অনুরূপ ক্ষেত্রে অগ্রণী সকলেই রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁদের ঋণ স্বীকার করেছেন।

আর এক বিষয়ে রামমোহন পথপ্রদর্শক না হলেও

অন্যতম প্রধান অগ্রপথিক। বাংলাভাষায় তিনি "সম্বাদ কৌমুদী" নামে একটি সংবাদপত্রও প্রকাশ করেছিলেন। পারসিক ভাষায়ও তিনি একটি সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন সেটা প্রধানত মুষ্টিমেয় ফারসী ভাষাভিজ্ঞ লোকেদের জন্য। স্বদেশী-ভাষায় সংবাদপত্র সম্পাদিত এবং প্রচারিত না হলে সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হবে না একথাও তাঁর ধ্যানের মধ্যে ছিল। "সম্বাদ কৌমুদী"তে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিলেই রাম-মোহনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে।

১। অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা।

২। সংবাদপত্রদ্বারা বাঙালীর উপকারিতা প্রদর্শন।

৩। চিৎপুর রোডে জল সেচনার্থে চাঁদা তোলার আবশ্যকতা।

৪। শবদাহার্থে অধিকতর প্রশস্ত স্থানের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন ও খ্রীস্টানদের সমাধিস্থান বিশালতর করিবার প্রচেষ্টা।

৫। তণ্ডুলের রপ্তানি বন্ধের নিমিত্ত আন্দোলন, কেননা ইহাই হিন্দুর খাভ।

৬। দরিদ্রগণের সাহায্যার্থে বিনামূল্যে ডাক্তারি চিকিৎসার নিমিত্ত রাজপুরুষগণের নিকট প্রার্থনা।

৭। দেবপ্রতিমা বিসর্জন কালে ইয়োরোপীয়-গণের বেগে শকট চালনার তীব্র প্রতিবাদ।

৮। কুলীনদের পরিণয় দোষ।

৯। বিভাশিক্ষার সুবিধা কি কি ?

১০। দীনহীনের শবদাহার্থে চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব।

১১। অসহায়া হিন্দু-বিধবাদের জন্য অর্থসঞ্চয়ের অনুষ্ঠান।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা আন্দোলনের তিনি জনক। ইংরেজরা এদেশে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার পরও বহুদিন স্থানীয় অধিবাসীর ধর্মবিশ্বাস এবং শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের চেষ্টা করেননি। এ বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট শঙ্কাও ছিল। দেশীয় লোকদের মধ্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম ইংরেজ-দের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত করার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এমন কি সরকারী কাজে ব্যবহৃত

পারসিক ভাষাকে স্থানান্তরিত করে ইংরেজিকে রাজকার্যের ভাষারূপে গণ্য করার আবেদন জানান। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমাহার্স্ট'কে একটি পত্র লেখেন, সেটি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। তিনি বলেছিলেন, সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার যে-অর্থ ব্যয় করছেন, তাতে আধুনিক চিন্তার প্রসার ঘটবে না। কারণ তখনকার দিনে সংস্কৃত-চর্চা ব্যাকরণের কূটতর্ক এবং অলঙ্কারের সূক্ষ্মতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ইংরেজরা নিজেদের দেশে শিক্ষাপদ্ধতির প্রাচীন প্রথা এবং গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার প্রাধান্য খর্ব করে বৈজ্ঞানিক-রীতি বিশেষ করে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে আহ্বান করে এনেছিলেন। ভারতবর্ষেও তার প্রয়োজন অস্বীকার করলে মনে হবে, বিদেশী সরকার ভারতবাসীকে চিরকাল অজ্ঞানতার অন্ধকারেই রাখতে চান। সরকার অবশ্য সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল বা কলেজ এবং আরবী ফারসী শিক্ষার জন্য মক্তব মাদ্রাসা তখনই বাতিল করে দেননি কিন্তু পাশাপাশি ইংরেজি স্কুলও স্থাপন করেছিলেন।

নূতন কিছু করতে গেলেই সর্বদেশে এবং সর্ব-

কালে প্রাচীনপন্থীরা কোনো না কোনো আপত্তি তোলেন। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রামমোহনের দূরদৃষ্টিকে সাধারণ লোক এবং অভিজ্ঞ শিক্ষিত লোকেরা পর্যন্ত ভুল বুঝেছিলেন। তাঁরা সাময়িক উত্তেজনায় একথা ভুলে গিয়েছিলেন যে, রামমোহন সংস্কৃত বা আরবী-ফারসী ভাষার জ্ঞানে কারও চেয়ে খাটো ছিলেন না। ভারতবর্ষীয় দর্শনকে এবং অন্য সাহিত্যের অনেক শাখাকে তিনি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তবুও ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন ছিল নূতন ভারতবর্ষ তৈরির জন্য।

১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতার মানিকতলা স্ট্রীটে "বেদ বিদ্যালয়" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেখানে বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। রামমোহনের প্রচারিত একেশ্বরবাদও এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ছিল। ইউরোপীয় বিজ্ঞানকেও এই পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

এর আগেই ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজের চেষ্টায়ই একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। যদিও বিরোধীরা প্রচার করেছিলেন, সে-স্কুলে খ্রীস্টধর্ম

শিক্ষা দেওয়া হয় তবুও প্রমাণ আছে কোনো ধর্মের নয় কিন্তু মানবসমাজের চিরন্তন নীতিগুলিই সে বিদ্যালয়ের মূল পাঠ্য বিষয় ছিল; আর ছিল বিজ্ঞান এবং ইংরেজি ভাষা।

বেদ প্রচারিত ধর্ম পুনঃ প্রচার করার অপরাধে তিনি যেমন বিধর্মী বলে পরিচিত হয়েছিলেন, তেমনি বিদেশী জ্ঞান ও ইংরেজির প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব থাকার জন্য তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের কথা বিরোধীপক্ষ ভুলে গিয়েছেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে একটি ছড়াও রাস্তায় ঘাটে সুর দিয়ে গান করে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছিল। সে ছড়াটি এরকম ঃ

"সুরাই মেলের কুল
ব্যাটার বাড়ি খানাকুল।
ওঁ তৎ সৎ বলে এক
বানিয়েছে স্কুল।
ও যে জেতের দফা
করলে রফা,
মজালে তিন কুল॥"

তাঁর স্কুল থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেবার জন্য অভিভাবকদের উপর চাপ দেওয়া হয়েছিল। সতীদাহ

বন্ধ করার জন্য যেমন তিনি শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়িয়েছেন তেমনি স্কুলের ছেলে জোগাড় করার জন্য বা ছাড়িয়ে নেওয়া ছেলেদের আবার ফিরিয়ে আনার জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়েছেন। ইংরেজি শিক্ষা এদেশীয়দের মধ্যে প্রচারের ব্রতে ডেভিড হেয়ার তাঁর সহযোগী ছিলেন। ডেভিড হেয়ার রামমোহন প্রতিষ্ঠিত "আত্মীয় সভায়"ও উপস্থিত থাকতেন।

এই ডেভিড হেয়ার, স্যর এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এবং দেশীয় কিছু শিক্ষাব্রতীর চেষ্টায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য "হিন্দু কলেজ" প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। কথিত আছে, রামমোহনই স্যর হাইড ইস্টকে চিঠি লিখে এ কার্যে প্রণোদিত করেন; তার ফলে ইস্ট সাহেব শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য লোককে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে উদ্যোগী হন। কিন্তু আলোচনার সময় একথাও প্রকাশ পায় যে, রামমোহন যদি এই নূতন বিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতে থাকেন তবে গোঁড়া হিন্দুসমাজের অনেকে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবেন না। তিনি 'বিধর্মী', অতএব তাঁর কাছ থেকে চাঁদাও নেওয়া হবে না। রামমোহন একথা

জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে সমস্ত
উদ্‌যোগ থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ান। ইংরেজি শিক্ষার
কলেজ স্থাপিত হোক এই ছিল তাঁর মনের অন্তরতম
বাসনা, সেটা তাঁরই চেষ্টায় হতে হবে এমন কোনো
অভিমান তাঁর ছিল না। তাছাড়া হিন্দু কলেজের
যে নাম এবং রূপটি সকলের অনুমোদন লাভ
করেছিল, তাতেও রামমোহনের আপত্তি ছিল।
প্রথমত হিন্দু কলেজ নামটি। দ্বিতীয়ত হিন্দু ছাড়া
অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের সে কলেজে প্রবেশের বাধা।
অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো রামমোহন শিক্ষাক্ষেত্রেও
জাতি বা ধর্মভেদ মানতেন না। সুতরাং হিন্দু
কলেজের জন্মলগ্নেই যে ভেদের চিহ্ন তাকে কলঙ্কিত
করেছিল রামমোহন সে কলঙ্কের ভাগী হতে
পারেননি। এই কলঙ্ক বহুকাল কলেজটীর দেহে লগ্ন
হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এই কলঙ্ক দূর হয়েছে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠা বা সরকারী কাজে
ইংরেজির ব্যবহার অবশ্য রামমোহন নিজে দেখে
যেতে পারেন নি। তাঁর প্রয়াণের পর এসব ব্যবস্থা
প্রচলিত হয়েছিল। সরকারী কাজে ইংরেজির
ব্যবহার আরম্ভ হয় তাঁর মৃত্যুর বছরেই—১৮৩৩
খ্রীস্টাব্দে। আর ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ইংরেজি শিক্ষা

এদেশে চালু হয়। রামমোহন বেঁচে থাকলে এ দুটিতেই সবচেয়ে আনন্দিত হতেন সন্দেহ নেই।

রামমোহনের জন্মের প্রায় দুই শতাব্দী আগে থেকে বৈজ্ঞানিক সত্য এবং নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলে পশ্চিমের দেশগুলি নূতন বল লাভ করে পৃথিবী বিজয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তবে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা লাভ বা বাণিজ্যের প্রসার। দেশের সঙ্গে দেশের সাংস্কৃতিক যোগ বা শিক্ষার আদান-প্রদানের কথা যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁরা ছিলেন একক। আর রামমোহনের আগে নূতন যুগের এই সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদান-প্রদানের কথা যাঁরা ভেবেছেন তাঁদের চিন্তার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল। সমস্ত পৃথিবীকে একনজরে দেখার প্রচেষ্টা রামমোহনই এযুগে প্রথম করেছিলেন। পৃথিবীতে যেখানেই একটা নীচগত কুসংস্কার বা দলীয় শাসন সংকুচিত হয়েছে, সেখানেই রামমোহনের অভিনন্দনের বাণী গিয়ে পেঁাছেছে। কখনও লিপিবদ্ধ আকারে, কখনও সহানুভূতির রূপ নিয়ে। কথিত আছে, স্পেনে প্রজাতন্ত্রীরা জয়ী হলে তিনি গৃহে ভোজসভা আহ্বান করে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। অথচ তখন স্পেনের নাম বা তার গৃহযুদ্ধের সংবাদ প্রাচ্যদেশে

তো বটেই পাশ্চাত্ত্য দেশের মধ্যেও তেমন আলোড়ন তোলেনি।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে শুধু সে-দেশে নয় সমগ্র পৃথিবীতে যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল তাঁকে রামমোহন নূতন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে মনে করতেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন ইংলণ্ডের পথে তখনও সুয়েজ খাল কাটা হয়নি। তাই আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ইংলণ্ডে পেঁাছাতে হত। উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে একটি জাহাজে ফরাসী দেশের পতাকা উড়ছিল। রামমোহন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হয়ে সে পতাকাকে অভিবাদন করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। কিছু-দিন আগে সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে তাঁর পা ভেঙে গিয়ে-ছিল। অন্যদের সাহায্যে তিনি নিজের জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালেন। তারপর পতাকাকে অভি-বাদন করে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন—Glory Glory Glory to France. অর্থাৎ বারবার ফ্রান্সের গৌরব গাথা উচ্চারণ করি। এত সুদূর দেশের কোনো অধিবাসীর কাছ থেকে এর আগে ফরাসী বিপ্লবের পরে এর থেকে মহতী পূজা আর পৌঁছায়নি।

গ্রীস দেশ তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার

জন্য যে আন্দোলন করছিল, তাতেও রামমোহনের সহানুভূতি নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে আবেদনেও রামমোহন অগ্রণী ছিলেন।

স্বদেশেও ভূ-সম্পত্তি অধিকারের আইন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য বিষয়ে তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন এবং যুক্তিহীন আইন-কানুনকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। তাঁর অনেক মতামত আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। এতদিন পূর্বে তিনি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছিলেন ভেবে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। তখনকার দিনের উন্নয়নমূলক যে-কোনো প্রয়াসের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সে-সব প্রয়াসকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মত অত্যন্ত দৃঢ় এবং কার্যপ্রণালী অত্যন্ত ঋজু ছিল বলে একদিকে যেমন একদল লোক তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর শত্রুরও অভাব ছিল না। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং সামাজিক নিপীড়ন তাঁকে প্রায় সারা জীবনই সহ্য করতে হয়েছিল। এক পক্ষের প্রতিভূ হয়ে তিনি অন্য পক্ষের নির্বিশেষ সমর্থন

কখনই লাভ করেননি। তিনি দুই বা ততোধিক বিরোধীপক্ষের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে সকল পক্ষের গুণাবলী এবং দোষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। অপমানের ভয় বা বন্ধুত্বের লোভ সত্য ভাষণ থেকে তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি। সে-কালের ভারতবর্ষে তো নয়ই, পৃথিবীর কোনো দেশেই তাঁর মতো দৃঢ়চেতা, দূরদর্শী এবং স্পষ্টবক্তা চরিত্র ছিল কিনা সন্দেহ।

চরিত্রের এই দৃঢ়তার সঙ্গে রামমোহন একটি কোমল অন্তঃকরণেরও অধিকারী ছিলেন। দুঃখী বা নিপীড়িতদের বেদনায় তাঁর অন্তর মথিত হত। সে বেদনা তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। অস্থিরভাবে তিনি সমস্ত ক্ষেত্রে পদচারণা করেছেন। যেখানেই অত্যাচার, যেখানেই কুসংস্কার, যেখানেই অপমান সেখানেই তিনি অত্যাচারিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অপমানিতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রতিপক্ষের মতামত সম্বন্ধে সহিষ্ণুতাও তাঁর এই কোমল হৃদয়ের পরিচায়ক। অথচ নিজের বেলায় তিনি অন্যের সহৃদয়তা বা সহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করেন নি, নিজেই নিজের সমালোচনায় ব্রত হয়ে নিজের কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। ব্যক্তিগত

সাহসিকতাও তাঁর অপর্যাপ্ত ছিল। কথিত আছে সমালোচনা, নিন্দা এবং কলঙ্কলেপনে তাঁকে বিচলিত না করতে পেরে বিরোধী কোনো পক্ষ তাঁকে দৈহিক আক্রমণও করেছিলেন। তিনি নিজের বাড়িতে সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনায় রত ছিলেন এমন সময় তাঁর বাড়ির জানালার সার্সিতে বড়ো বড়ো ইটের টুকরো এসে পড়তে লাগল। অন্যান্যরা এতে ভয় পেয়ে গেলেন। রামমোহন বলেছিলেন, আপনারা ভয় পাবেন না। এঁদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ আমার শেষ হয়েছে, যদি মল্লযুদ্ধ করতে হয় তবেও আমি পেছপা হব না। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে আপনাদের গায়ে আমি আঁচড়টুকুও লাগতে দেব না। এই কথা বলে তিনি বাইরে দরজা খুলে আক্রমণকারীদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু যাঁরা তর্কযুদ্ধে হেরে গিয়ে পিছন থেকে দৈহিক আক্রমণ করে তাঁরা সাধারণত কাপুরুষ, রাম-মোহনের মার মূর্তি দেখে তাঁরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

শিশুদের রামমোহন অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর বিদ্যালয়ে যারা পড়ত তাদের তো বটেই, তাঁর সহযোগী বা সহকর্মীদের প্রতি তাঁর অত্যন্ত স্নেহ

ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল, অনেকেই দেশের নানাক্ষেত্রে নেতারূপে পরিগণিত হয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে তিনি শিশুবয়সে রামমোহনের কাছে কি রকম স্নেহ মমতা লাভ করেছিলেন তার বর্ণনা আছে। তাঁকে রামমোহন আদর করে "বেরাদর" বা ভাই বলে সম্বোধন করতেন। এটি একটি ফারসী শব্দ। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব, আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু-কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচু ছিঁড়িয়া, কখনো কড়াইশুঁটি ভাঙিয়া মনের সুখে খাইতাম!" রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, 'বেরাদর!

রোদ্রে হুটাপাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত নিচু খেতে পার এখানে বসিয়া খাও।' মালীকে বলিলেন, 'যা, গাছ থেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়।' সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। রামমোহন রায় বলিলেন, 'যত ইচ্ছা নিচু খাও।'

তাঁহার মূর্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন অঙ্গ চালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া টানিতেন, ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন, 'বেরাদর এখন তুমি টান।'

শুধু দেবেন্দ্রনাথ নন, আরওঅনেক ছোটো ছেলে তার এই বাগানে এসে তাঁর সঙ্গ লাভ করতেন। একদিন একজন বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি ছোটো ছেলেদের মতো দোলনায় দোল খান কেন? তিনি বলেছিলেন, আমি জাহাজে করে বিলেত যাব, তখন ঢেউয়ের দোলায় যাতে অসুস্থ না হয়ে পড়ি তার জন্য এই দোলনায় দুলে অভ্যেস করে নিচ্ছি। তাঁর স্কুলের সব ছেলেদেরই তিনি স্নেহ

মমতায় জয় করে নিয়েছিলেন। তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

রাজারাম বলে তাঁর একজন পালিত পুত্র ছিল, তাঁকে তিনি বিলেতেও নিয়ে গিয়েছিলেন, রামমোহনের শিশুদের প্রতি এই স্নেহ-মমতার কথা স্মরণ করে তাঁর বিলেতে অবস্থান কালে একটি নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় রামমোহন। সভ্য-অধিকৃত একটি দেশের একজন অধিবাসীকে এ সম্মান দেওয়া তখন প্রায় অচিন্ত্যনীয় ছিল।

১৮২১-১৮২৬ পর্যন্ত রামমোহনের পারিবারিক নানা বিপর্যয় ঘটেছিল। তাঁর মাতার এবং স্ত্রীর মৃত্যু, পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি তাঁর মনঃকষ্টের কারণ হয়েছিল। তাছাড়া তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস এবং সংস্কার আন্দোলন তথা শিক্ষা এবং শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মতামত গ্রহণের জন্য দেশ এবং জাতি তখন প্রস্তুত হয়নি। তাই আঘাতে আঘাতে তিনি জর্জরিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যাঘাত করেননি এবং সকল প্রকার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতাও তাঁর অপরিসীম ছিল। দেশবাসীর অকৃতজ্ঞতা তাঁর দেহে এবং মনে একটি বেদনার চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, তাঁর আয়ত চোখ দুটিকে কারুণ্যে

ভরে দিয়েছিল। তিনি জানতেন, যে-সব নূতন পথ এবং মত তিনি দেশবাসীর দ্বারে রেখে গিয়েছিলেন, সেদিন অবজ্ঞা করলেও একদিন তাঁরা সাদরে সেগুলিকে জীবনে এবং মননে গ্রহণ করবেনই। সেদিনের অবজ্ঞা একদিন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হয়ে তাঁকে খুঁজে খুঁজে বেড়াবে। কিন্তু সেদিন তিনি আর "খ্যাতি নিন্দার জ্বরে" কম্পিত হবেন না। সেই অনাগত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনিও হয়তো অপমানবিদ্ধ ক্রুশ থেকে যীশুখ্রীস্টের মতোই বলেছিলেন, "ভগবান এঁদের তুমি ক্ষমা করো, কারণ এঁরা কি করছে এঁরা জানে না।" আজও তাঁকে নিয়ে বিতর্কের অবসান হয়নি। কলঙ্ক কালিমা আজও তাঁর দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে কিন্তু তাঁর যে-প্রতিকৃতিটি আমাদের সমধিক পরিচিত সেই প্রতিকৃতির মতোই তাঁর ঋজু চরিত্র সে কালিমার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আমাদের আশ্বস্ত করছে। তাঁর জীবনের ছোটো ছোটো ঘটনা থেকে তাঁর সমগ্র জীবনের মানসী মূর্তিটিই ধ্রুবতারকার মতো আমাদের দিক নির্ণয়ে সাহায্য করছে।

ইয়োরোপ যাকে আমরা বিলেত বলি সেখানে যাবার ইচ্ছে রামমোহন অনেকদিন থেকেই মনে মনে পোষণ করছিলেন। তবে বাধা ছিল দুটি। একটি

হল রামমোহন ধর্ম বা সমাজ বা শিক্ষা সংস্কারের যে সব কাজের সূচনা করেছিলেন সেগুলি তখনও পুরোপুরি সফল হয়নি। আর দ্বিতীয়টি হল সামাজিক বাধা! রামমোহন নিজেই লিখেছিলেন, "এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে পর্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয় সে পর্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।" কিন্তু রামমোহন বিদেশে যাবেন শুনেই গোঁড়া জনমত আবার অশান্ত হয়ে উঠল। এর আগে কোনো হিন্দু সন্তান জলযানে ম্লেচ্ছ দেশে যাত্রা করেনি। রামমোহনের সংকল্প প্রকাশিত হবামাত্র নানা মহল থেকে ধিক্কার ধ্বনি উঠতে লাগল। তাতে অবশ্য রামমোহন বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বিলেত যাবার কারণ তাঁর নিজের ভাষায় এরূপ। "পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ বিষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবর্ষবাসিগণের প্রতি ব্যবহার বহুকালের জন্য স্থিরীকৃত হইবে ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউনসিলে আপীল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০

সনে নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এতদ্‌ভিন্ন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাটকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্মচারী-দিগের নিকট আবেদন করিবার জন্য তিনি আমাকে ভারার্পণ করেন।" রামমোমন রায়ের ইংলণ্ড যাবার সংকল্প শুনে দিল্লীর বাদশা তাঁর অধিকার সম্পর্কিত কতকগুলি আবেদন ইংলণ্ডের অধীশ্বরের নিকট পেশ করার জন্য রামমোহনকে দূত নিযুক্ত করেন এবং "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। সেটা ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসের কথা।

ইংলণ্ডে যাবার আগেই সেখানকার অনেক মহলে তাঁর নাম পরিচিত ছিল। খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁর একটি ইংরেজি বই ইংলণ্ডে প্রচারিতও হয়েছিল। তিনি বহু ভাষাবিদ্ প্রাচ্য দর্শনে সুপণ্ডিত এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ্ বলে পরিচিত হয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাঁর বিদেশ যাত্রার দিন তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের গৃহে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর অনুরাগী অনেক ভক্ত সমবেত হয়েছিল। গৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না। ইংলণ্ডেও তাঁর অনুরাগী বন্ধুরা তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পালিতপুত্র রাজারাম এবং আরও দুজন ছিলেন। জাহাজে তিনি সকলের সঙ্গে বসে খেতেন না। তাঁর নিজের পাচক ছিল। সঙ্গে একটি দুগ্ধবতী গরুও ছিল। তিনি সাধারণত ফলমূল খেতেন। তবে জাহাজের অন্যান্য যাত্রীরা তাঁর আচরণ এবং ভদ্রতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জাহাজের নাবিকরাও তাঁর প্রতি অত্যন্ত সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করতেন। রামমোহন নিজেও সকল যাত্রীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের প্রতি তাঁর সুশালীন ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

তখনও সুয়েজখাল কাটা হয়নি। সুতরাং আফ্রিকার শেষ প্রান্তের উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ইংলণ্ডে যেতে হল। উত্তমাশা অন্তরীপ বন্দরে অবস্থানের সময় ফরাসী পতাকাকে অভিবাদন করার কাহিনী আগেই বিবৃত হয়েছে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে রামমোহন লিভারপুল শহরে পৌঁছে ইংলণ্ডের মাটিতে পদক্ষেপ করেন। একজন গুণগ্রাহী ইংরেজবন্ধু তাঁকে নিজের গৃহে থাকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু রাম-মোহন স্বাধীনভাবে থাকতে পারবেন ভেবে একটি

হোটেলে থাকাই স্থির করেন। হোটেলে বহু বিশিষ্ট লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁকে King of Ingee অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজা বলে উল্লেখ করা হত।

লিভারপুলে রামমোহন পৃথিবী বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম রস্কোর সঙ্গে দেখা করে-ছিলেন। সুদূর ভারতবর্ষ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে রস্কো রামমোহনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। লিভারপুলে রস্কো পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। তবু চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও রাম-মোহনকে নিজের গৃহে আমন্ত্রণ করে তার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।

লিভারপুলে প্রকাশ্য সভায়, নিজের আবাসে এবং খ্রীস্টীয় উপাসনালয়ে বহু লোক তাঁর দীপ্ত মুখচ্ছবি এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শুনে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে সম্মান দেখিয়েছিলেন। একজন ভারতবর্ষীয় যাঁকে সাধারণ ইংরেজরা গোঁড়া এবং সংস্কারাচ্ছন্ন বলে মনে করতেন, তাঁরমুখে ইংলণ্ডের আসন্ন শাসন-সংস্কার সম্বন্ধীয় বি ফরম বিলের জোরালো সমর্থন শুনে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে যান। অনেকে মনে করেন, যে-কোনো খ্রীস্টধর্মাবলম্বীর

থেকে তিনি খ্রীস্টধর্মের মূলতত্ত্ব অধিকতর গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আবার ভারতবর্ষের ধর্মানুশীলনের এরকম সুষ্ঠু ব্যাখ্যাও তাঁরা এর পূর্বে কখনও শোনেননি। রামমোহনও ইংলণ্ডের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে স্বদেশের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে দেখে মুগ্ধ হন। ভারতবর্ষে স্বদেশ সম্বন্ধে এই সচেতনতার অভাব তাঁকে পীড়া দিতে থাকে।

কিছুদিন লিভারপুলে থেকে তিনি লণ্ডনে চলে যান। পথে শিল্পনগর মানচেস্টারে কিছুকালের জন্য থেমেছিলেন। সেখানকার শ্রমিকরা 'ভারত-বর্ষের রাজা'কে দেখবার জন্য অতি মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের তিনি আসন্ন রি ফরম বিলকে সমর্থন করার অনুরোধ জানান।

লণ্ডনে পৌছানো মাত্রই আধুনিক ব্যবস্থা দর্শনের স্রষ্টা জেরেমি বেনথাম রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। প্রথম দিন অবশ্য দেখা হয়নি কিন্তু পরে একের সঙ্গে অন্যের আলোচনায় দুজনেই অত্যন্ত লাভবান্ এবং প্রীত হয়েছিলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীশ্বরের দেওয়া তাঁর 'রাজা' উপাধিকে কখনও প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি

কিন্তু ইংলণ্ডের সম্রাট সেটা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেন এবং ভারতবর্ষের প্রতিনিধির মর্যাদা দান করেন। একটি বিশেষ ভোজে রামমোহন রায় নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষও অবশ্য তাঁকে প্রকাশ্য সভায় সম্মানিত করেন। ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজও তাঁকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

রামমোহন ব্রিটিশ পারলামেণ্টরি কমিটির নিকট ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রশাসনিক প্রথা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার জন্য আহুত হন। জমিদারী প্রথা এবং অল্প বয়সের ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারতবর্ষে পাঠানো সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন।

ইংলণ্ড থেকে ফরাসী দেশে যাবার জন্য তখন বিদেশীদের জন্য যে বাধা-নিষেধ ছিল রামমোহন ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে সে সম্বন্ধে বিনয়ের সঙ্গে অথচ কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছিলেন। অবশেষে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফরাসী দেশে পদার্পণ করেন। সেটা তাঁর কাছে স্বপ্নের দেশ। ফরাসী সম্রাট তাঁকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। সেখানকার পণ্ডিত সমাজেও রামমোহন বিশেষ

আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে ফরাসী ভাষা শিখে ফেলেন।

ইংলণ্ডে ফিরে এসে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। সেজন্য তিনি ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে বাস করতে যান। সেখানে স্টেপলটন গ্রোভ নামে একটি সুন্দর গৃহে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। রামমোহনের দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যাঁরা নজর রেখেছিলেন তাঁরা তিনজনই নারী। তাঁদের প্রতি রামমোহনের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই নারীদের একজন লিখে-ছিলেন, "আমি যদি ইংলণ্ডের রাণীও হতাম তবুও তাঁর কাছে থেকে এরূপ সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ প্রত্যাশা করতাম না।" শ্রীমতী কারপেনটার নামে এক মহিলা রামমোহনের চিকিৎসকের দিনলিপি থেকে তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি দিনের বিবরণ লিখেছেন। সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহনের মাথায় যন্ত্রণা হতে থাকে এবং নানা উপসর্গ দেখা দেয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শয্যাপার্শ্বে তাঁর বন্ধু ডেভিড হেয়ারের বোন শ্রীমতী হেয়ার উপস্থিত ছিলেন।

তাঁকে যেন ভারতবর্ষীয় প্রথায় সমাহিত করা হয় রামমোহন এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সে-

ইচ্ছা অনুসারে স্টেপলটন গ্রোভের উদ্যানে তাঁর অন্ত্যেস্টিক্রিয়া করা হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলেতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর দেহাবশেষ 'স্টেপলটন গ্রোভ' থেকে সরিয়ে 'আরনস ভেল' নামে আর একটি উদ্যানে নিয়ে আসেন এবং দেহাবশেষের উপর একটি মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন।

সে মন্দির ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। রাম-মোহনের সারাজীবন অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কেটেছে। কর্মের শত আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু ব্রিস্টল শহরের একপ্রান্তে তাঁর সমাধি মন্দিরটি একটি শান্তির নীড়ের মতো তাঁর দেহাবশেষকে ধারণ করে আছে। ভারতবর্ষের মাটি তাঁর দেহকে ধারণ করার সুযোগ পায়নি কিন্তু তাঁর মননকে যদি ভারতবাসী অন্তরে ধারণ করতে পারে তবে দেশ ধন্য হবে।

দ্বারকানাথ তাঁর সমাধি মন্দিরে একটি ইংরেজি প্রশস্তি রচনা করে দিয়েছিলেন। তার অনুবাদ করলে এ-রকম দাঁড়ায়ঃ

"এই প্রস্তরখণ্ডের নীচে—

রাজা রামমোহন রায়ের মরদেহ সমাধিস্থ আছে। ঈশ্বরের উপলব্ধির ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস

যুক্তিসম্মত ও অবিচল ছিল, একমাত্র স্বর্গীয় শক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করে-ছিলেন। তাঁর জন্মগত প্রতিভার সঙ্গে তিনি নানা ভাষা শিক্ষার প্রবণতাকে যুক্ত করে অতি অল্পকালের মধ্যেই সম-সাময়িক যুগে পণ্ডিত সমাজের শিরোমণি বলে গণ্য হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের জনগণের সামাজিক, নৈতিক এবং ঐহিক উন্নতির জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, মূর্তিপূজা এবং সতীদাহ প্রথা রোধের জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং ঈশ্বরের গৌরব প্রচার ও মানুষের কল্যাণের প্রসারের জন্য তাঁর নিরন্তর সতর্ক প্রয়াস চিরকালের জন্য দেশ-বাসীর স্মৃতিতে অমর করে রেখেছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য অত্যন্ত বেদনা এবং গৌরবের সঙ্গে এই স্মৃতি ফলক স্থাপিত হল।”

বাংলাদেশের রাধানগরে তিনি ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রিস্টলে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দেহত্যাগ করেন।

রামমোহনের জীবিতকালে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বহু পরিমাণে বঞ্চিত হয়েছেন। একথা সত্য যে, বহু পণ্ডিত তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্ভ্রম। কিন্তু সমগ্র দেশ তাঁকে

কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দেয়নি। হয়ত সেইজন্যই ভারতবর্ষের মাটি তাঁর দেহাবশেষ ধারণের গৌরব পায়নি। রামমোহনের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ছবি ধরা পড়েছিল। ভারতবর্ষে তখনকার দিনে তো বটেই এখনও সে ছবি আমাদের কাছে স্পষ্ট ধরা দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ রচিত "ভারত পথিক রামমোহন রায়" গ্রন্থে একটি প্রতীক-ধর্মী ঘটনার উল্লেখ আছে। উপসংহারে সেটি উদ্ধৃত করছি।

"একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময় রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন। তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল।

পিতার নিকট বর্ণনা শ্রবণকালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব মানসী মূর্তি আমার মনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখশ্রীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদ মহিমা, বঙ্গদেশের সুদূর ভবিষ্যতকালের সীমান্ত পর্যন্ত, স্নেহ চিন্তাকুল কল্যাণ কামনার

কোমল রশ্মিজালরূপে বিকীর্ণ দেখিতে পাই। আমরা বঙ্গবাসী নানা সফলতা এবং বিফলতা, দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব, আশা এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনার পথ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিতে পাইতেছি, এখনও আমাদের প্রতি সেই নব্য-বঙ্গের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিষাদদৃষ্টি নিস্তব্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত চেষ্টার অবসান করিয়া এই জীবলোকের কর্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব, যখন নবতর বঙ্গবাসী নব নব শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার রঙ্গভূমির মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, তখনও রামমোহন রায়ের সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর বিষণ্ণ বিশাল দৃষ্টি তাহাদের সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ বিকীর্ণ করিতে থাকিবে।··· তখনও বঙ্গসমাজের অভ্যুদয় হয় নাই, তখন ছোটো ছোটো গ্রাম্যসমাজ-পল্লীসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়াছিল; ···এমন সময়ে একদিন রামমোহন রায় তাঁহার মহৎ প্রকৃতির, তাঁহার বৃহৎ সংকল্পের সমস্ত অপরিমেয় বিষদভাবে লইয়া আমার পিতাকে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন।···

ফলত, বঙ্গসমাজপুরীর পুরাতন রাজপথের আজ

অনেক নূতন সংস্কার হইয়া গিয়াছে, পথ এবং জনতা উভয়েরই বহুল পরিমাণে রূপান্তর দেখা যাইতেছে, কিন্তু তথাপি আমি কল্পনা করিতেছি, যে-শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্তী আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি, এখনও তাঁহার উন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই। এখনও তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।”